□□□□ □□□□□□□

দেশবাসী নিশ্চয় শোকরিয়া আদায় করবেন যে, অসাংবিধানিক পথ ও পন্থার পথ থেকে দেশ রক্ষা পেয়েছে। সাংবিধানিক নিয়ম ও বিধিবিধান না মানার প্রবণতা থেকে রেহাই মিলেছে। সংবিধান হচ্ছে নিয়ম-নীতি মানার কাঠামো গ্রন্থ। সাংবিধানিক বিষয় লিপিবদ্ধ রয়েছে সংবিধানে। তাই সংবিধানের নিয়মনীতি অনুসরণ করা সব রাজনৈতিক দলেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু সংবিধান লঙ্ঘন করার সংস্কৃতি দেশবাসী দেখেছে পঁচাত্তরপরবর্তী দুই সামরিক জান্তা শাসক ও তাদের উত্তরসূরিদের মধ্যে। আরেক সংবিধান প্রণেতা তো মনে করেন, এক মিনিটের মধ্যেই সংবিধান সংশোধন করা যায়। যেমনটা করেছেন সামরিক শাসকরা। কলমের এক খোঁচায় মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত মূলমন্ত্র সংবিধান থেকে উচ্ছেদ করার কাজটি ক্ষমতা দখলকারী সামরিক শাসকরা অবলীলায় করেছেন। রক্তে অর্জিত বাহাত্তরের সংবিধানকে এক নিমিষে বদলে ফেলা হয়েছে। সংবিধানকে এত কাটাছেঁড়া করতে তারা জনগণের কোন মতামত নেয়া দূরে থাক, সংসদকেও গুরুত্ব দেয়নি। নিজেদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার স্বার্থে সংবিধানকে যেমন ব্যবহার করেছে, কাটাছেঁড়া করেছে, তেমনি সংবিধান স্থগিত রেখে সামরিক আইন বহাল রেখে দ-মুন্ডের হর্তাকর্তা সেজে বসেছিল জান্তারা। এখনও তাদের প্রেতভূরা সংবিধানবহির্ভূত পথ ও পন্থা অবলম্বন করে ক্ষমতা দখল করতে প্রাণান্ত শ্রম দিয়ে যাচ্ছে।

দেশবাসী উদ্বেগ ও শঙ্কামুক্ত এই কারণে যে, অনির্বাচিত অসাংবিধানিক সরকার গঠনের মাধ্যমে দেশকে বিপথে নেয়ার সব আয়োজন ভেস্তে গেছে। দেশ অস্থিতিশীলতার দিকে ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে তিরোহিত। ফলে অরাজকতার মাধ্যমে জনগণের জানমালের নিরাপত্তার বিঘœ ঘটার সংশয়, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা লুপ্ত হলো। যারা এই পথে যেতে চেয়েছিলেন, অশুভ পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়েছিলেন, তারাই ১/১১-এর তিনউদ্দিনের শাসনকালকে প্রলম্বিত করেছিলেন। সংবিধানে তিন মাস মেয়াদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলেও এই অনির্বাচিতরা টানা দুই বছর ক্ষমতা ধরে রেখেছিলেন। এই অনির্বাচিত সরকারকে দীর্ঘমেয়াদী করার জন্য ডক্টর কামাল, ডক্টর ইউনূসরা যে চক্রান্তে মেতেছিলেন, তা ভেস্তে গেছে গণরোষে। ২০০6 সালে খেয়ালখুশিমতো সংবিধানকে ব্যবহার করে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন নিয়ে চক্রান্তে মেতেছিল। নিজ দলীয় সমর্থক বিচারপতিকে তত্ত্বাবধায়ক প্রধান করার জন্য বিচারপতিদের চাকরির বয়স বাড়ানো হয়েছিল। বিরোধী দলের আন্দোলনের মুখে তা করা সম্ভব হয়নি। বরং রাষ্ট্রপতিকে তত্ত্বাবধায়ক প্রধান করে সরকার গঠনের প্রাথমিক পর্বে হোঁচট খেতে বাধ্য হয়েছে। রাষ্ট্রপতিকে খেয়ালখুশিমতো ব্যবহার করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে বিতর্কিত করে তোলা হয়। ঘটনা এমনও ঘটে যে, কয়েকজন উপদেষ্টা পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরে ফখরুদ্দিন আহমদকে প্রধান করা হয় কামাল হোসেন ও ইউনূসের সুপারিশ এবং তৎপরতায়। এই দুজন সেই সরকারের অদৃশ্য উপদেষ্টায় পরিণত হয়ে রাজনীতিকে স্থূলতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া শুধু নয়, রাজনীতিকদের নিপীড়ন, জেলবন্দীও করা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে অযাচিত হস্তক্ষেপ করে অচলাবস্থা তৈরি করা হয়। সর্বোপরি 'মাইনাস টু' ফর্মুলায় দুই নেত্রীকে জেলবন্দী করা হয়। কামাল-ইউনূসদের গণতন্ত্র ও সংবিধানবিরোধী ভূমিকায় কথিত সুশীলদের সঙ্গে নিয়ে যেসব কা--কারখানা ঘটিয়েছেন, তার রেশ এখনও ফুরায়নি। শেখ হাসিনাকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য কত কসরতই না সে সময় তারা করেছেন। তারা এমনটাও বলেছেন, প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করে অনির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সরকার ব্যবস্থা দীর্ঘ সময় বহাল রাখা হবে। সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত এই সরকার ব্যবস্থার প্রতি সমাজের সর্বস্তরের ক্ষোভ ফেনিয়ে উঠেছিল। যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধানে সংযোজন করা হয়েছিল, সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার সবকিছু তছনছ করে দিয়েছে। বিএনপি-জামায়াতের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের মাশুল দেশবাসীকে দিতে হয়েছে। জনগণ তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। আদালতও এই অনির্বাচিত সরকার ব্যবস্থার পক্ষে অবস্থান নেয়নি। তারও আগে ২০০১ সালের তত্ত্ব¡াবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ থাকেননি। বিচারপতি লতিফুর রহমান বিএনপি-জামায়াতের পক্ষে অবস্থান নিয়ে নির্বাচনে তাদের বিজয়ী করার জন্য যে 'নোংরা' খেলায় মেতেছিলেন, তাতে এই সরকার ব্যবস্থার প্রতি মানুষ বিরূপ হয়েছিল। শুধু তাই নয়, প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে বিএনপি যাদের নিয়োগ দিয়েছিল, তাদের অদক্ষতা, অযোগ্যতা নির্বাচন কমিশনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল। একজন তো 'রাধাধ্যান, রাধাজ্ঞান' বলে মন্ত্রোচ্চারণও করেছিলেন। উন্মাদনার চূড়ান্ত পর্যায়টি দেশবাসী দেখেছিল। নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হলেও বিএনপি- জামায়াত তা নিয়ে অসাংবিধানিক পথ ও পন্থা অবলম্বন করে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছিল।

ড. কামাল হোসেন দ্বিতীয় দফা সংলাপে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের কাছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে রূপরেখা দেন, তা ছিল সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। নির্বাচনকালীন সরকারের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করলেও বিএনপি কৌশলগত কারণে তা পেশ করেনি। ফ্রন্টের দেয়া নির্বাচনকালীন সরকারের এই প্রস্তাব ক্ষমতাসীন জোটের পক্ষ থেকে নাকচ করে দিয়ে বলা হয়, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের সঙ্গে

সাংঘর্ষিক। ফলে নতুন করে এই সরকার ফিরিয়ে আনার আইনগত ও সাংবিধানিক কোনো ভিত্তি নেই। কিন্তু কামাল হোসেন এই দাবিকে ১৬ কোটি জনগণের দাবি বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেলেছেন। শুনে হাসির উদ্রেক হতে পারে। ১৬ কোটি মানুষের দাবি বলে যা তুলে ধরা হয়েছে, তার সঙ্গে কোটি কোটি মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই। যদি তাই হতো তবে সরকার বাধ্য হতো অনির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে সংবিধান লঙ্ঘনের কাজটি করতে। কামাল হোসেনের এই জনগণ আসলে বিএনপি-জামায়াত সমর্থক। তাদের তিনি চশমা চোখে ১৬ কোটি মানুষ মনে করছেন। কিন্তু তার এই দাবির পক্ষে জনগণের কোনো সাড়া অদ্যাবধি মেলেনি। সিলেট, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ঢাকায় ঐক্যফ্রন্ট যে চারটি সমাবেশ করেছে, তাতে সাধারণ জনগণের উপস্থিতি ছিল না। সবই ছিল বিএনপি-জামায়াত সমর্থক। কামাল হোসেন গংয়ের নামসর্বস্ব সংগঠনের কোনো অনুসারী বা সমর্থক নেই বলে সমাবেশে মূলত বিএনপি-জামায়াত কর্মীরাই ছিল, জনগণ নয়। ১৬ কোটি জনগণের দাবি যদি হবে, তবে আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলীয় জোট এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির জনগণ কোথায়? তারা যদি এই দাবির পক্ষে হবে, তবে তো কামাল হোসেনের ‘কেল্লা ফতে’ হতে দেরি হতো না। ঐক্যফ্রন্ট যে ৭ দফা ও ১১ লক্ষ্য উপস্থাপন করেছে, তার অর্ধেকেরই বেশি হচ্ছে সংবিধানকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে অনির্বাচিতদের শাসন ব্যবস্থা চালুর এক চক্রান্ত। শেখ হাসিনার সঙ্গে দু’দফা সংলাপে ঐক্যফ্রন্ট নেতারা স্পষ্ট করতে পারেননি তাদের দাবিসমূহ। সংবিধানের আলোকে ব্যাখ্যাও দিতে পারেননি।

সংবিধানকে লঙ্ঘন করে নির্বাচনের আগে সংসদ ভেঙে দেয়ার যে প্রস্তাব বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত ঐক্যফ্রন্ট সংলাপে তুলে ধরেছে তার নেপথ্যে অন্যরকম খেলা যে রয়েছে, তা স্পষ্ট। সংসদ নিষ্ক্রিয় এখন। সংবিধান অনুযায়ী সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে। এই সংসদ ভেঙে দিলে যে শূন্যতা তৈরি হবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার, তাকে ভঙ্গুর করার এটিও একটি পাঁয়তারা। এমনকি প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করার যে বাহানা তারা করছে। সূক্ষ্ম চক্রান্ত তা নয়, বরং অশুভ শক্তির আছর নামানোর বিরাট ষড়যন্ত্র বৈকি। দেশে এখন যদি কোনো নাজুক পরিস্থিতি তৈরি হয়, এমনকি যুদ্ধবিগ্রহও, তবে সংসদকে পুনরুজ্জীবিত করে অধিবেশন ডেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিধান রয়েছে। সংসদ এবং সরকার পদত্যাগ মানেই সংবিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করা। নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের দাবিটিও ষড়যন্ত্রের আরেক পর্ব। সকল দলের প্রস্তাবে সার্চ কমিটি গঠন করে এই কমিশন গঠন করা হয়েছে। যা অতীতে জিয়া-এরশাদ-খালেদা কখনও করেনি। এই কমিশন সর্বসম্মতিক্রমে গঠনের পর তা বাতিল করে আজিজ, রউফ বা সাঈদ মার্কা কমিশন গঠন করার দুঃস্বপ্ন কামাল হোসেন বিএনপি-জামায়াতকে নিয়ে দেখতেই পারেন। কিন্তু জনগণ তা চাইবে কেন। কমিশন স্থানীয় সরকার নির্বাচন ছাড়াও জাতীয় সংসদের কয়েকটি আসনের উপনির্বাচন যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছে। সামরিক শাসক ও বিএনপি-জামায়াতরা যেভাবে নির্বাচন কমিশনকে বশংবদে পরিণত করেছিল, সেভাবে বশংবদ কমিশন এখনও তারা চায়। বরং শেখ হাসিনা এই অব্যবস্থাকে দূরীভূত করে যে উত্তরণ ঘটিয়েছেন, তাতে সার্চ কমিটির আলোকে সর্বসম্মতভাবে বর্তমান কমিশন গঠিত হয়েছে। নির্বাচন কমিশন বর্তমানে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে। যা অতীতে সম্ভব হয়নি। এখন তারা তফসিলে পরিবর্তন আনার দাবি তুলছে যাতে যথাসময়ে যাতে নির্বাচন হতে না পারে, পরিস্থিতিকে সেদিকে নিয়ে যেতে চান। সমঝোতার মাধ্যমে বর্তমান কমিশন গঠিত হওয়ার পর নতুন করে আবার আলাপ আলোচনার মাধ্যমে গঠন করার এই দাবির পেছনে চক্রান্ত অবশ্যই রয়েছে। আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যে কামাল হোসেনেরা দেদার কথা বলে থাকেন, সেই তিনি ফৌজদারি মামলার দুর্নীতির দায়ে দণ্ডিতদের ‘রাজবন্দী’ হিসেবে মুক্তি দাবি করে নিজের আইন পেশাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। আইনকানুনের তোয়াক্কা না করার এই প্রবণতা যদি ‘খ্যাতিমান’ আইনজীবী দাবি করেন, তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার যে কথা তিনি বলেন, তারই চরম লঙ্ঘনের নামান্তর। সাংবিধানিক বিধিবিধানকে দুমড়ে মুচড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়ার জন্য অবশেষে কামাল হোসেন নিজেই অবস্থান নিয়েছেন। যে সংবিধান প্রণয়নে নিজে জড়িত ছিলেন, তার টুঁটি চেপে ধরে তিনি যে ‘অসৎ’ উদ্দেশ্য হাসিল করতে চান, তা বোঝার জন্য আইনশাস্ত্র পাঠের প্রয়োজন হয় না। সংবিধান মেনেই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে। কিন্তু কামাল হোসেন সংবিধান নিয়ে তার দাবির পক্ষে যৌক্তিকতা তুলে ধরতে পারেননি। বরং বায়বীয় কথাবার্তা দিয়ে জোর করে বাধ্য করাতে চান সংবিধান লঙ্ঘন করানোর জন্য। কোনো নিয়ম-নীতি মেনে চলবেন না-এমন গোঁয়ার্তুমি কামাল হোসেন গংয়ের মানায় না যদিও। তারপরও তারা বিএনপি-জামায়াতকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এসব অসংলগ্ন দাবি- দাওয়া তুলে ধরছেন। আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনা বিদ্বেষ থেকে তিনি যা করছেন তা রাজনীতি নয়। বরং অপরাজনীতি। আরও এক ধাপ এগিয়ে বলা যায়, এ সবই পূর্ব পরিকল্পিত চক্রান্তের অংশ। কিন্তু বাস্তবতা বলে, সেই একাত্তর থেকে অদ্যাবধি কামাল গংয়ের কোনো চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র বা পরিকল্পনা সফলতা পায়নি। বরং বার বার ভেঙে চুরে পতিত হয়েছে মৃত্তিকাতে। ১৯৮৬ সালে সামরিক শাসক এরশাদের অধীনে নির্বাচনে অংশ নিতে আওয়ামী লীগকে বাধ্য করেছিলেন কামাল হোসেন। সে সময় তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি চালু, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের দাবি তোলেননি। সে নির্বাচন তিনি ‘গো-হারা’ হেরেছিলেন। বিএনপি-জামায়াতের শিখণ্ডী হিসেবে আজ পরিচিত কামাল হোসেন যে পথ ধরে এগিয়ে যেতে চান, সে পথে কোনো জনগণ নেই। আছে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি ও তাদের প্রতিভূরা এবং

পাকিস্তানী কানেকশন। দেশ ও জাতির স্বার্থ জড়িত এমন কোন দাবি তিনি ও তার সহযোগীরা গত পাঁচ বছরেও উত্থাপন করেননি। কোন ভূমিকাও পালন করেননি। গত ২৮ বছর ধরে তিনি তার স্ব-সৃষ্ট গণফোরামের সভাপতি পদ আঁকড়ে রেখেছেন। দলে গণতন্ত্রের চর্চা নেই। সেই তিনি অন্যদেরকে গণতন্ত্র শেখাতে চান। স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত হয়ে বর্ষীয়ান আইনজীবী যা করছেন, তা স্বাভাবিকতা বর্জিত।

দেশ এখন নির্বাচনী জোয়ারে ভাসছে। জনগণের মধ্যে ভোটের উৎসব শুরু হয়েছে। জনগণ স্বস্তিতে রয়েছে যে, দেশ অসাংবিধানিক পথে যাচ্ছে না। শেখ হাসিনার দৃঢ়তায় সংবিধানের পথ ধরে নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এই কৃতিত্ব শেখ হাসিনাসহ ১৪ দলীয় জোটের। তাই জনগণ শোকরিয়া আদায় করছে দেশ রক্ষায় শেখ হাসিনার উজ্জ্বলতর ভূমিকার জন্য। শেখ হাসিনা কোন তালবাহানায় অভ্যস্ত বা বিশ্বাসী নন। তাই তিনি সংলাপে প্রায় সবদলের দাবি-দাওয়া মেনে নিয়েছেন সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে। সুষ্ঠু নির্বাচনের আয়োজন সফল হোক– প্রত্যাশা দেশবাসীর।